হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (রাহ.)

আদাবুস সুলুক
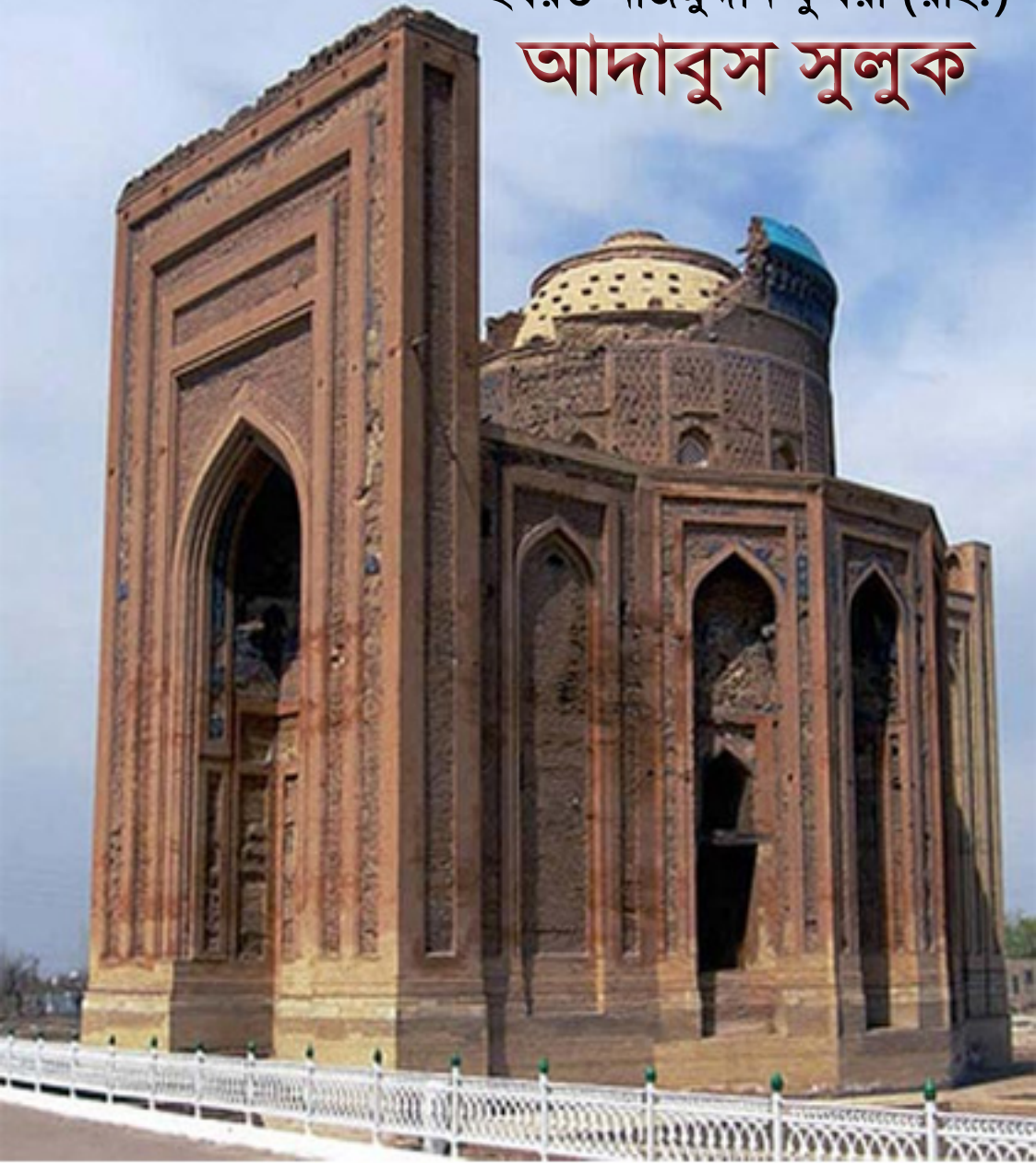
অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট, বাংলাদেশ।

আদাবুস সুলুক

মূল:

হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

অনুবাদ:

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! আজ থেকে ৮ শতাধিক বছর পূর্বে সে যুগের শ্রেষ্ঠ শায়খুল মাশাইখ হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত তাসাওউফ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব 'আদাবুস সুলুক' এর বঙ্গানুবাদ পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে ধরতে পেরেছি। কিতাবটি ছোট্ট কিন্তু এর ভাব ও অর্থ গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তরীকতপন্থী সবার জন্য এ'টি সুখপাঠ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের প্রধান গবেষক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এ কিতাবটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। ইতোমধ্যে খানক্বার গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ২০-২৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এদের বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেও পাঠ করতে পারেন। নিচে ওয়েবসাইটের লিংকটি দেওয়া হলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সিলেট।
০৩/২৩/২০১৭

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদির ওয়েভসাইট লিংক:
https://archive.org/search.php?query=Engineer%20Azizul%20Bari

লেখক পরিচিতি : হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি ছিলেন ‘কুবরাবিয়া’ সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্ববিখ্যাত সুফি-দার্শনিক, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তরীকতের মুর্শিদ। ঈসায়ী ১২তম শতকের এই সুফি-দরবেশ পারস্যের ‘খোয়ারিজম’ শহরে বাস করতেন। তিনি হযরত শিহাবুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে হাবাশ সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত শামসুদ্দীন তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক তরীকতের শায়খ ছিলেন।

হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫৪০ হিজরি / ১১৪৫ ঈসায়ী [বর্তমান উজবেকিস্তানের] খোয়ারিজম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালীন নাম ছিলো আহমদ। তাঁর কুনিয়াত ছিলো ‘তাম্মাতুল কুবরা’। হাদিস ও কালাম শাস্ত্রে তিনি উচ্চতর অধ্যয়ন শেষে মিশরে চলে যান। শরীয়তের ওপর গভীর জ্ঞানার্জন তাঁর সন্ধানী হৃদয়ের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে মেটাতে পারে নি। সে যুগে মিশরে বাস করতেন হযরত ওয়ায়িস কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত সুফি তরীকা ‘ওয়ায়িসিয়া’র অনুসারী শায়খ রুজবাহান বাক্বিল মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর হতে বাইআত গ্রহণ করেন। মুর্শিদ রুজবাহান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এ প্রিয় মুরীদকে সর্বাধিক বেশি আদর-মুহাব্বত করতেন। কিছুদিন পরই নিজের মেয়েকে নাজমুদ্দীন কুবরার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। হযরত বাক্বিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ হিসাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুফি-জীবনের প্রতি আত্মনিয়োগ করার পর নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

পুনরায় তরীকতের সালিক হিসাবে মুসাফির বেশে বের হন। এসময় সুফিদের রাস্তা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন হযরত শায়খ জিয়াউদ্দীন আম্মার বিতলিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট।

স্বীয় শায়খ ও শ্বশুর হযরত বাক্বিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পক্ষ থেকে তরীকাতের খিরক্বা [খিলাফতি] লাভের পর হযরত কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই একজন শায়খ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দলে দলে লোকজন তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে থাকেন। বেশ কিছু সুফি লেখকও তাঁর মুরীদ ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের অনেকেই মা'রিফাতের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'ওলি তারাশ' [ওলি সৃষ্টিকারী] উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি স্বপরিবারে স্বীয় জন্মস্থান খোয়ারিজমে ফিরে আসেন ও একটি খানক্বাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই তাঁর শিষ্যরা তাঁরই নামানুসারে তরীকার নতুন নামকরণ করেন, 'কুবরাবিয়া'।

সুফি রাস্তার সালিকের মধ্যে হালের অবস্থায় যেসব কাশ্‌ফ ও স্বাপ্নিক অভিজ্ঞতা আত্মপ্রকাশ করে এগুলোর ওপর তিনি বেশ কিছু গবেষণা করে গেছেন। এছাড়া তিনি পবিত্র কুরআনের একটি সুফি তাফসির গ্রন্থ আংশিক রচনা করেন। এটি সম্পন্ন করার পূর্বেই ৬১৮ হিজরি / ১২২১ ঈসায়ী তিনি ইন্তিকাল করেন। মঙ্গলদের কর্তৃক দেশের পর দেশ বিজয়ের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। নিজের বাসস্থান থেকে হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

তরীকতের সালিকদের আদব-কায়দার ওপর তাঁর লিখিত 'আদাবুস সুলুক' কিতাবটি ছাড়াও তিনি আরো বেশ ক'টি গ্রন্থের রচয়িতা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো:

১. ফাওয়াহিল জামাল ওয়া ফাওয়াতিহিল জালাল

২. উসূলুল আশারা

৩. রিসালাতুল খাইফুল হায়িম মিল লাওমাতুল লাইম

কুবরাবিয়া সুফি তরীকা অনুসারীদের সংখ্যা এ যুগে খুব কম। এর মূল কারণ হলো, পরবর্তীতে হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন নখশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নখশবন্দিয়া' তরীকা এর স্থলাভিষিক্ত হয়। কুবরাবিয়াদের অধিকাংশ জিকির-মুরাক্বাবা পদ্ধতি নখবন্দিয়ারা অনুসরণ করে থাকেন।

হযরত ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছাড়াও হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আরো কয়েকজন বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন, যাঁরা তরীকতের খিদমাত করে গেছেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরতের মোট খলিফাদের সংখ্যা ছিলো ১২ জন। এর মধ্যে ৬ জনের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. হযরত নাজমুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

২. হযরত সাইফুদ্দীন বাখিজরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৩. হযরত মাজদুদ্দীন বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৪. হযরত আলী ইবনে লালা গজনবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৫. হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি [তিনি ছিলেন হযরত জালালুদ্দীন রুমী রাহ.-এর পিতা]।

৬. হযরত সাদ উদ্দীন হামুওয়ায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

শেষোক্ত শায়খ খিলাফত লাভের পূর্বে মুর্শিদের নির্দেশ থাকাসত্ত্বেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। এ সময় মঙ্গলদের কর্তৃক হামলা থেকে বাঁচা খুব কঠিন ছিলো। লোকজন নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো জীবন রক্ষার্থে। নিজের শায়খকে একা রেখে তিনি যান নি। কিছুদিনের মধ্যে নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর এই বিশেষ মুরীদকে খিলাফত প্রদান করেন। শায়খ সাদ উদ্দীন পরবর্তীতে কুবরাবিয়া তরীকা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার জন্য। এ মহাবিশ্ব ও এতে যাকিছু আছে তা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি সবকিছুর খালিক, মালিক ও পালনকর্তা। আমরা সকলেই তাঁর সৃষ্ট বান্দা-বান্দী। তিনি আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেভাবে রাজি-খুশী সেভাবে ইবাদত-বন্দেগীর তাওফিক তাঁরই নিকট কামনা করছি। হে আল্লাহ! এ অধম বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হোন। আপনার সাহায্য ছাড়া একমুহূর্তের জন্যও আনুগত্যশীল গোলাম হতে পারবো না। জীবনে যেটুকু লেখালেখি করার তাওফিক আপনি দিয়েছেন তা সবই একমাত্র আপনারই সন্তুষ্টি কামনায় করেছি। বর্তমান এ গ্রন্থটি লেখার আগ্রহও একমাত্র আপনার করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায়। হে আল্লাহ আপনি এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি আখেরী যামানার নবী, মানবতার প্রতি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আরো দরূদ ও সালাম পেশ করছি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় আসহাবে কিরামের প্রতি।

হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত ছোট্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের নাম ছিলো 'ফী আদাবিস সালিকীন' [সালিকদের আদব]। মূল ফারসি কিতাবের একটি কপি এখনো এশিয়ান যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের আরবি সংস্করণের নামকরণ করা হয়, 'আদাবুস সুলুক ইলা হযরত মালিকুল মুলক'। গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে আল-হাক্ক তথা আল্লাহর দিকে ভ্রমণের বর্ণনা এসেছে।

হযরত কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাঞ্জল ভাষায় হাক্বিক্বাত উন্মোচনের পথের পর্দাসমূহ সরানোর পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আল্লাহর প্রশস্ত জমিনে নিজের শারীরিক ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেছেন। বর্তমান এই অনুবাদটি শুধুমাত্র প্রথমোক্ত খণ্ডের একটি ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা হয়েছে। তরীকতের সালিকদের মধ্যে যাঁরা খোদান্বেশার শরাবে আত্মহারা আছেন তাঁদের জন্য এ গ্রন্থটি হবে পিপাসা নিবারক সুপেয় সুধা। আমি আল্লাহর দরবারে এটাই কামনা করছি যে, গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর বান্দা-বান্দীদের অন্তরাত্মা তাঁকে পাওয়ার তীব্র প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠবে।

অনুবাদে ভুল-ত্রুটির জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। সবশেষে গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
লন্ডন, ১০ অক্টোবর, ২০১২।

তিনিই সত্য - الحقُّ هو

যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি অসীম প্রজ্ঞাবান ও করুণাময়। তিনি আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে দিগন্তের [আফাক্ব] ওপর সফর করতে সাহায্য করেন যাতেকরে তারা তাঁর অসীম বিস্ময়কর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নমুনা কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় তাঁর মাহাত্ম্যের প্রমাণাদি। দেখতে পায় তাঁর কৃপা ও করুণার ব্যাপ্তি বিশ্বের সকল দিক-দিগন্তে ও জগতের সকল কোণে; তিনি আল্লাহ, যিনি সালিকের নফসে আম্মারার মৃত্যু ঘটান এবং উন্মুক্ত করেন তার অভ্যন্তরের সর্বাধিক গোপন রহস্যাবলী। তিনিই বাইরে উজ্জ্বল করে উন্মোচন করেন যাকিছু লুকানো ছিলো বান্দার ভ্রমণের ভীষণ কষ্ট-সাধনার ফসলস্বরূপ। এসব ফসল আসে বান্দার পক্ষ থেকে বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ, নিজ বাসস্থান, সন্তানাদি, আপনজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকা, গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত থেকে একমাত্র আল্লাহ মালিকুল মুলকের সাথে থাকার ফলে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও প্রশংসা বর্ষিত হোক মানবজাতির নেতা, সর্বোত্তম মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ও তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের প্রতি। বর্ষিত হোক অনাবিল শান্তি তাঁর আসহাবে কিরাম ও উম্মাহর প্রতি। অতঃপর, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত করছি হাযারাতুল হাক্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট।

হে আল্লাহর বান্দাহ! জেনে রাখো তুমি একজন সালিক। তোমার প্রভুর সন্ধানে লিপ্ত আছো। আর অবশ্যই একদিন তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটবেই। যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: "যে কেহ আল্লাহর

সাথে সাক্ষাতের কামনা করে তার জানা থাকা উচিত যে, সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হবেই।” তোমাদের এটাও জানা থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ তা’আলা তাঁর অসীম এবং যথার্থ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আদমসন্তানের জন্য দু’টি সফরের ব্যবস্থা করেছেন। এর প্রথমটি হলো অনৈচ্ছিক ও দ্বিতীয়টি হলো ঐচ্ছিক।

অনৈচ্ছিক ভ্রমণ

অনৈচ্ছিক ভ্রমণের প্রথম স্তরের শুরু পিতার কোমর [সুল্‌ব] থেকে। দ্বিতীয় স্তর মায়ের উদর। তৃতীয় স্তর দৃশ্যমান পৃথিবী বা হায়াতে জিন্দেগী। চতুর্থ স্তর কবর বা আলমে বরযখ- যা হবে মনোমুগ্ধকর সুদৃশ্য, চিরশান্তির বেহেশতের উদ্যান না হয় জাহান্নামের ভীষণ যন্ত্রণা ও বিভীষিকাময় গর্ত। সর্বশেষ পঞ্চম স্তর হলো পুনরুত্থান দিবস। এর স্থায়ীত্বকাল আমাদের হিসাবে ৫০ হাজার বছর।

পঞ্চম স্তর পাড়ি দেওয়ার পর তুমি তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থানে দাখিল হবে। এটাই তোমার আসল মনযিল। তবে হ্যাঁ- এ মনযিল হতে পারে সকলের কাঙ্ক্ষিত চিরশান্তির বাসস্থান [দারুস্‌ সালাম], প্রশান্তি ও নিরাপত্তার বাগান, যদি তুমি হয়ে থাকো সুনির্বাচিত ও ওয়ালিউল-হাক্বদের অন্তর্ভূক্তজন। অপরদিকে তোমার বাসস্থান হয়ে যেতে পারে অগ্নিকুণ্ড ও চরম শাস্তির গর্ত, যদি- আল্লাহ না করুন, তুমি হয়ে যাও ওসব চরম দুর্দশাগ্রস্ত, হক্ব আল্লাহর দুশমনদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা’আলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

-“পুনরুত্থান দিবসে একদল লোক হবে জান্নাতবাসী আর অপর একদল লোক হবে জাহান্নামবাসী।”

প্রতিটি শ্বাস যা তুমি গ্রহণ করছো তার মাধ্যমে একটি পদক্ষেপ নিচ্ছো মৃত্যুর পথে। তোমার জীবনের প্রতিটি দিবস হলো একেকটি [পারসাঙ]। প্রত্যেক মাস একেকটি মারহালাহ’র [স্তরের] মতো। আর প্রত্যেক বছর একেকটি অবস্থানস্থলের [মনযিলের] মতো। তোমার

ভ্রমণ যেনো সূর্য ও চন্দ্রের প্রদক্ষিণপথে চলন্তাবস্থার মতো। অথচ এই ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণপথে চলন্তাবস্থার ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ গাফিল! আর তোমার এই উপেক্ষা ও গাফিলতির কারণে নিজেকে আগত মনযিলগুলো অতিক্রম করার প্রস্তুতি তুমি গ্রহণ করো নি। সামনে আগত নিশ্চিত মানাযিল হলো কবর, হাশর ও চিরস্থায়ী বাস্তব বাসস্থান।

ঐচ্ছিক ভ্রমণ

ঐচ্ছিক ভ্রমণ দু'ধরনের:

১. বাদশাহদের বাদশাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে আত্মা ও হৃদয়ের ভ্রমণ।

২. আল্লাহর জমিনে শারীরিক [জিসমানী] ভ্রমণ।

উপরোক্ত উভয় ভ্রমণের উপর আলাদা অধ্যায় রচিত হবে। এর ফলে তুমি অবগত হবে ভ্রমণের জন্য জরুরী পাথেয় সম্পর্কে। দিকনির্দেশনা করা হবে পথের তোরণসমূহ কিভাবে উন্মুক্ত করতে হবে। জানতে পারবে এ পথে ভ্রমণের আদব-কায়দা যা হবে প্রত্যেক ভালো আমল ও ধর্মকর্ম পালনের জন্য উপকারী সাথী স্বরূপ। এসব আদব-কায়দা ভ্রমণপথে আশিকীন ও খোদান্বেষীদের সম্বল। আর আল্লাহ চাহে তো, এসব দিকনির্দেশনা অধম বর্ণনাকারীর জন্য পুনরুত্থান দিবসে মাওলার সম্মুখে উপকারী হবে। এটাই আশা।

হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ও করুণার দরজা আমাদের জন্য খুলে দাও! হে আল্লাহ! তুমি তো উদার ও মহৎ!

মহান গৌরবময় প্রভুর দিকে ভ্রমণ ও এর মর্মার্থের ওপর আলোচনা

হে আল্লাহর গোলাম! জেনে রাখো- আল্লাহ তা'আলা মানুষকে

কয়েকটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি করেছেন: তার হৃদয় বা আত্মা তাঁর দিকে ভ্রমণ করবে ও নৈকট্য লাভে ধন্য হবে; সে দৃষ্টিপাত করবে তাঁর গৌরব ও সৌন্দর্যের প্রতি - যা হলো সকল লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, দানশীলতা ও প্রতিদানের সর্বশেষ স্তর।

প্রথম পর্যায়

এ পৃথিবী ও এর মধ্যে যাকিছু বিদ্যমান এবং পরকাল ও তার মধ্যে যাকিছু আছে, সবই সৃষ্ট হয়েছে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ হাসিলের জন্য। নবী-রাসূলদের [আলাইহিমুস্ সালাম] আবির্ভাব, পবিত্র মহাগ্রন্থ কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব নাজিল হওয়ার কারণও ওসব উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে করীমে ঘোষণা দিয়েছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

-অর্থাৎ, "এবং আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কোনো কারণে সৃষ্টি করি নি।" [জারিয়াত (৫১):৫৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখানে 'লিইয়া'বুদূন' [যাতে তারা আমার উপাসনা করে] কথাটির অর্থ হলো, 'লিইয়া'রিফূন' [যাতে তারা আমাকে জানতে পারে]। অর্থাৎ, সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে যাতে করে আমাকে জানা হয়।

[অনেক সুফি কিতাবে বর্ণিত] একটি হাদীসে কুদসীতে আছে:

كُنت كنزاً خففِياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق لِكي أعرف

-অর্থাৎ, "আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার; তারপর আমি ইচ্ছা করলাম নিজেকে প্রকাশ করতে। সুতরাং আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলাম, যাতে করে আমাকে জানা হয়।"

তবে জেনে রাখো, এ জানার ভ্রমণে মানবের হৃদয় পর্দা দ্বারা ঢেকে যায়। সৃষ্টি হয় অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, বেড়ে যায় [বান্দা ও প্রভুর মধ্যে] বিরাট দূরত্ব।

ভ্রমণের মধ্যে আরো আছে আল্লাহর নৈকট্যের মাত্রা, স্তরসমূহ ও মাক্বামাত [অবস্থানস্থল]। যদি কেউ পথের বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে যেথে সক্ষম না হয়, তাহলে নৈকট্যের কোনো মাত্রাই অর্জন করতে পারবে না।

পবিত্র সত্তা বা প্রভু [হাদ্বরাতুল কুদ্‌স] কখনো আত্মপ্রকাশ হবেন না, যদি না সালিক তার নিজ [হুজুবান-নাফ্‌স] এর পর্দাকে ছিড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। সুতরাং প্রথম পর্দা, যার কারণ হলো সর্বশক্তিমান প্রভু [হাদ্বরাতুল ইয্‌জা] থেকে বিচ্ছিন্নতা, তাহলো তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাঁর শরীক করা [শিরক] এবং তাঁর মহান গৌরব ও ত্রুটিহীনতার ওপর সন্দেহ করা। এসবের ফলাফল হলো আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা [কুফর]। আর এটাই হলো পর্দাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গাঢ় ও অন্ধকার পর্দা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ...

-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে।" [নিাস (৪):৪৮, ১১৬]

সুতরাং প্রভু-সন্ধানী সালিকের জন্য এটা জরুরী যে, নিজ হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলো দ্বারা উজ্জ্বল করে তোলা। চিরন্তন বাস্তবতার নূর [ইয়াক্বিন] আসবে ঐ হৃদয়ে যার মধ্যস্থ সন্দেহের অন্ধকার বিলুপ্ত হয়েছে। তাওহিদে পৌঁছুনোর জন্য বহুদেবতাবাদের আঁধার থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ঈমানের নূর অর্জনে প্রয়োজন হয় নিজেকে অস্বীকৃতির হতবুদ্ধিতা থেকে মুক্ত করা। এসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নিলে, তার দেহ ও আত্মা চিরন্তন অন্ধকার এবং নরকের

সর্বনিম্ন স্তরে থেকে যাবে। এ স্থান তো আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী কাফির, ধর্মহীন ও আল্লাহর দুশমনদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে দ্বিতীয় পর্যায় হলো, আল্লাহর আনুগত্য [তা'আহ] এবং তাঁর দাসত্ব ['উবুদিয়াত]। কারণ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন: "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর উপাসনা করো।" এছাড়া সহীহ হাদিসে কুদসীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যারা আমার নৈকট্য কামনা করে, তাদের আকাঙ্ক্ষা সফল হবে না, যদি না তারা যাকিছু আমি অবশ্যকরণীয় করেছি তা তারা পালন করে। আমার বান্দা সর্বদাই আমার নৈকট্য হাসিলে সচেষ্ট থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে, যতক্ষণ না সে আমার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়।"

অতএব, যে কেউ তাঁর প্রভুকে [মাওলাকে] জানে সে তাঁর নির্দেশ মানতেই হবে। আর যে কেউ তার মা'বুদকে পেয়ে গেছে সে তো অবশ্যই তাঁর উপাসনা করবে। অন্যথায় সে তো অন্ধকারের মধ্যেই পড়ে থাকবে। সে পড়ে থাকবে গোনাহ ও প্রভু-নিন্দার স্তরে- কারণ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহ থেকে দূরত্বের [বু'দ] একটি স্তর এবং আনুগত্যতা হলো তাঁর নৈকট্য হাসিলের উপায়।

তৃতীয় পর্যায়

আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে তৃতীয় পর্যায় হলো ভালো কর্মসাধন। সুতরাং, সত্যের সন্ধানী সালিকের জন্য জরুরী হলো নিজের সকল মূল্যহীন কর্মকাণ্ডকে মূল্যবান ও প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে রূপান্তর করা। কারণ, প্রত্যেক প্রশংসনীয় কাজই প্রভুর নৈকট্য হাসিলের উপায়

হিসাবে বিবেচিত।

প্রত্যেক নৈতিক কলঙ্ক হলো তাঁর থেকে দূরে সরে পড়ার একেকটি পদক্ষেপ। এগুলো হলো তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ। সুতরাং, সত্যিকার সালিকের জন্য অবশ্যকরণীয় কাজ হলো গরিমার অন্ধকার থেকে বিনয়ের আলোর দিকে ফিরে আসা। ফিরে আসা হিংসার নীচতা থেকে অনুরাগ ও করুণার দিকে। কৃপণতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসা উদারতার উচ্চতায়। ফিরে আসা অকৃতজ্ঞতার অন্ধকার অতল গহ্বর থেকে কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আভায়। কপটতার অন্ধকার থেকে ফিরে আসা আন্তরিকতার নূরোজ্জ্বল পথে। জাগতিক ভাসা-ভাসা সৌন্দর্য ও ধনভাণ্ডারের মরুভূমির প্রতি আকর্ষণ থেকে ফিরে আসা প্রেমের বাগিচায় ও ইহ-পরলোকের প্রভুর প্রতি নির্ভরশীলতায়। ফিরে আসা [ভিত্তিহীন] নিরাপত্তার অন্ধকার থেকে প্রভুভীতির আলোকবর্তিকায়।

হতাশাপূর্ণ অস্পষ্টতা ও অবিশ্বাস থেকে ঘুরে আসতে হবে আশা ও বিশ্বাসের নূরের মধ্যে। ঘুরে আসতে হবে ক্রোধ ও রাগের ছায়া থেকে ধৈর্য ও সহনশীলতার আলোর মাঝে। প্রতিকূলতা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন অবস্থায় অধীরতা ও উদ্বেগের অন্ধকার থেকে ফিরে আসতে হবে ধৈর্যশীলতার আলোতে এবং নিয়তির তিক্ততার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। হতবুদ্ধিতা ও একগুয়েমির অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়ে অর্জন করতে হবে আত্মসমর্পণ ও বিনয়ের রৌশনী। জাগতিক বস্তুর প্রতি নির্ভরশীলতার অন্ধকার থেকে ঘুরে আসতে হবে মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রভু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ওপর পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের মধ্যে। ফিরে আসতে হবে অসদিচ্ছা ও [হারাম] ভোগবাসনার আঁধার থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার আজ্ঞানুবর্তিতার অংশুমালায়।

সুতরাং, এ ভ্রমণ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ। ঐশি নৈকট্য আকাঙ্ক্ষীদের জন্য তো এ ভ্রমণ অবশ্যকরণীয়। এ ভ্রমণ অবশ্যকরণীয় আখিরাতের সর্বোচ্চ প্রশান্তি ও চিরশান্তির বাসস্থান লাভের সন্ধানীদের জন্য।

চতুর্থ পর্যায়

আধ্যাত্মিক চতুর্থ পর্যায় হলো 'আসমাউল হুসনা' [সুন্দর নামসমূহ] ও 'সিফাতুল হাক্ব' [আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ] এর মধ্যে ভ্রমণ। কারণ যে মুহূর্তে সালিক [প্রভু থেকে] দূরত্ব-সৃষ্টিকারী তার 'বাতিন' [অভ্যন্তর] নিজকে কলুষমুক্ত করবে এবং সে তার অন্তরকে সংশোধন ও পালিশ করে তুলবে নৈকট্য অর্জনের আদব-কায়দা [জিকির-আজকার, মুরাক্বাবা-মুজাহাদা ইত্যাদি] দ্বারা, তখন সে যোগ্যতা লাভ করবে সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার। এটা তো তার প্রতি মহান আল্লাহর মুহাব্বত ও করুণার দৃষ্টির আত্মপ্রকাশ তার মাঝে। এ স্তরে আওলিয়া [বন্ধুজন] ও সাফিয়্যা [নির্বাচিতজন] এর মর্যাদার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা, তাঁর পবিত্র নামসমূহ স্বীয় বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রতিটি নাম আধ্যাত্মিক একেকটি রাজ্যের [ইক্বলিম] অধিকারভুক্ত। আর প্রত্যেক রাজ্যের আছে একেকটি উচ্চতর প্রাধিকার [সুলতান]। আরো আছে প্রতিটি রাজ্যের একেকটি রাজসভাসদ, পরামর্শসভা, উপহারসামগ্রী ও প্রতিদানসমূহ। শেষোক্ত বস্তুসমূহ ইক্বলিমের সকল মানুষকে তাদের প্রাপ্যানুসারে বিতরণ করা হয়। আর তিনি [আল্লাহ] নির্বাচিতজনদের হৃদয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন বিশেষ অবস্থানস্থল। একজন ওলি প্রথম ইক্বলিমে থেকে যেতে পারেন, কারণ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র ঐ নামটি জানেন যা এ ইক্বলিমের অধিকারভুক্তির জন্য খাস।

প্রায়শঃই হয়ে থাকে যে, কোনো একজন ওলির মাক্বাম একই সময় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইক্বলিমে বিদ্যমান আছে। সুতরাং যখনই

তিনি যে কেনো ইক্বলিমের দিকে মনোনিবেশ করবেন, সেই ইক্বলিমের নাম তাঁর ওপর আবর্তিত হয়। তিনি হচ্ছেন আওলিয়াকূল শিরোমণি যিনি সকল নাম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।” হযরত তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেছেন: “সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা এসব ঐশি নামের অংশীদার হয়, তারা হলো এ নামসমূহের ওপর বিশ্বাসী। আর যারা ‘আসহাবুল ইয়ামিন’ [মাঝে অবস্থানভূক্ত লোকজন] এবং সাধারণ ওলি, ঐশি নামসমূহে তাদের অংশীদারিত্ব নির্ভর করে এসব নামের প্রতি নিজেদের হৃদয় উন্মোচন ও ইলমে মা’রিফাতের দ্বারা অর্জিত আলোকরশ্মির ওপর, যা ঐশি নামগুলোতে বিদ্যমান আছে।”

প্রত্যেকেই নিজ হৃদয়ে যেটুকু আধ্যাত্মিক আলো ধারণ করেছে সে মুতাবিক প্রশান্তি লাভ করবে। কিন্তু নির্বাচিত আওলিয়ায়ে কিরাম যারা দুনিয়াবী আশক্তির পোশাক সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলে পরে নিয়েছেন নতুন আধ্যাত্মিক বস্ত্র, তাঁরা তো ঐশি নামসমূহের হাক্বিকাত সরাসরি অবলোকন করেন। এগুলোর আলো হৃদয়ে সর্বদা গ্রহণ করেন। আমাদের শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যা বলেছেন, তার দ্বারা বুঝা যায় প্রত্যেক ওলির জন্য একেকটি স্টেশন [মাক্বাম] নির্ধারিত আছে। তিনি এটা অতিক্রম করেন না। এ মাক্বামটি তাকে আল্লাহ তা’আলা প্রদান করেছেন তার সামর্থ এবং যোগ্যতা মুতাবিক।

অতএব, যখন তাঁর হৃদয় এই জানা মাক্বাম অর্জন করে, তিনি তাঁর অতিন্দ্রীয় সফরের শেষ সীমানায় পৌঁছুয়ে যান। এটাই তাঁর লক্ষ্যস্থল। তাঁর ভ্রমণের ইতি ঘটে। এই ভ্রমণ অবশ্য এক জায়গা থেকে শরীরিকভাবে অপর জায়গায় যাওয়া বুঝাচ্ছে না। না ভ্রমণকারী স্থানের মধ্যে চলে, না সে বিশেষ গন্তব্যস্থলে যায়। কারণ, মহান আল্লাহ তা’আলা তো আর দূরে নন- তিনি মানুষের শাহরগ থেকেও কাছে। এখানে ‘ভ্রমণ’ বা ‘সফর’ মানে হৃদয়কে যেসব পর্দা আবৃত করে রেখেছে ওগুলো উপড়ে ফেলার সাধনা। এগুলোই হলো ঐশি নামের আলোকরশ্মি দ্বারা সালিকের হৃদয় আলোকিত হওয়ার পথে বাধা। আর এই ভ্রমণের জন্যই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ ভ্রমণের জাহিরী আবদ-কায়দা

তোমার জানা থাকা দরকার যে, হৃদয়ের ‘সাইর ইলাল্লাহ’ তথা আল্লাহর দিকে ভ্রমণের জন্য বেশ কিছু আইন-কানুন আছে। এদের অনেকগুলো প্রকাশ্য [জাহিরী] ও অনেকগুলো গোপন [বাতিনী] আদব।

প্রথম মূলনীতি

জাহিরী আদবের প্রথম মূলনীতি হলো সালিককে [অপ্রয়োজনীয়] মাল-সম্পদ বিসর্জন দিতে হবে। তাকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। সে তার মুর্শিদের খেদমতে থাকবে ও তাঁর আনুগত্য করবে। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও জিকরুল্লাহর মধ্যে নিজকে ডুবিয়ে দেবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

-“আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।” [মুয্‌যাম্মিল (৭৩):৮]

দ্বিতীয় মূলনীতি

জাহিরী আদবের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো নির্জনবাস ও নিজেকে মানুষ থেকে দূরে রাখা। বিশেষ করে ওসব লোক থেকে দূরে থাকতে হবে যাদের সঙ্গে মেলামেশায় আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে বাধার সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন:

-“তাদের থেকে দূরে থাকো এবং উপেক্ষা করো ওদেরকে যারা আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে ডাকে।”

তৃতীয় মূলনীতি

জাহিরী আদবের তৃতীয় মূলনীতি হলো সালিক তার দেহের সাতটি অঙ্গকে প্রভুর নিকট ঘৃণ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত কর্ম থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। এগুলো হলো:

১. তার চোখ কখনো ওসব বস্তুর দিকে তাকাবে না যা নিষিদ্ধ এবং নিজের জন্য অপকারী।

২. তার কান শুনবে না মিথ্যা-কলঙ্ক -অপবাদ, নিন্দাবাদ, অশ্লীল শব্দ এবং অনুরূপ কথা।

৩. তার জিহ্বা ২-এ বর্ণিত অনুরূপ বাক্যালাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

৪. তার ঠোঁটদ্বয় এমন কথা বলা থেকে বন্ধ থাকবে যা তার জন্য কোনো ফায়দা নিয়ে আসে না।

৫. কোনো কোনো ওলি বলেছেন, সালিকের মুখ থেকে আল্লাহর স্মরণ সর্বদা উচ্চারিত হতে হবে। তার নীরবতা হবে আল্লাহর ধ্যানের মধ্যে এবং বস্তুর প্রতি চাওয়া থেকে সে গ্রহণ করবে শিক্ষা।

৬. তার পেটকে সে হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য থেকে মুক্ত রাখবে। হালাল খাদ্যও সে রাক্ষসের মতো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থেকে ভক্ষণ করবে না; বরং খাবার গ্রহণের সময় তাকে হৃদয়ে জাগ্রত ও আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

৭. তার পা, হাত ও যৌনাঙ্গকে হারাম ও ঘৃণ্য কর্ম থেকে সর্বদা দূরে রাখতে হবে।

চতুর্থ মূলনীতি

এ ভ্রমণের চতুর্থ মূলনীতি হলো, সালিককে সর্বদা তার নফ্সে আম্মারার [খারাপ নিজ-এর] বিরোধিতা করতে হবে। এর অর্থ: ভালো খাবার, ভালো পানীয়, ভালো বস্ত্র, হৃদয়াকর্ষণমূলক কার্যাদি ও চলার জন্য ভালো আরোহণ গ্রহণ ইত্যাদি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলে বিরোধিতা করা। নফ্সে আম্মারার বিরোধিতাই হলো 'জিহাদে আকবর' [বড়ো ধর্মযুদ্ধ]। এ সম্পর্কে মানবজাতির সর্বযুগের সর্বকালীন মহান নেতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

"তোমরা জিহাদে আসগর [কাফিরদের বিরুদ্ধে ছোট ধর্মযুদ্ধ] থেকে জিহাদে আকবরে [নফ্সে আম্মারার বিরুদ্ধে বড় ধর্মযুদ্ধে] ফিরে এসেছো।"

আর জিহাদে আকবর হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতিদান অনেক বড়ো ও ব্যাপক। উরাফাদের মতে, নফসের বশ্যতার মানে হলো আগ্নিকুণ্ডে লাকড়ি নিক্ষেপ করা। অথচ তালিব ও সালিকের কাজ হলো নফ্সকে নিশ্চিহ্ন করতে অভ্যন্তরস্থ আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া।

পঞ্চম মূলনীতি

এ ভ্রমণের পঞ্চম মূলনীতি হলো সালিককে একজন আ'রিফ, হক্ব এবং প্রজ্ঞাবান শায়খের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হবে। এই মুর্শিদ তাকে এ রাস্তায় পথনির্দেশনা করবেন যাতে করে সে পূর্ণতা ও সত্যাপোলব্ধি লাভে ধন্য হয়। কারণ সালিক তো একজন রোগির মতো যাকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ক্ষতিকর পীড়া-ব্যধি ও মন্দ জিনিস। সে তো বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ-শোকে আক্রান্ত। অথচ সালিক নিজে এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! আর জ্ঞাত থাকলেও সে জানে না নফসের এসব রোগের প্রতিকার কি কি জিনিস হতে পারে? সুতরাং একজন

করুণাশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন দক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর নেই। এ চিকিৎসকই পারেন তাকে বলে দিতে রোগের স্বরূপ ও এর প্রতিকার। বলে দিতে পারেন কোন্ কোন্ উপায়ে সে এসব রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। অন্যকথায়, একজন সালিক হলো বিপজ্জনক ও ভীতিকর একটি মরুভূমির পথিকের মতো। সে জানে না তার গন্তব্যস্থলের সঠিক দিকনির্দেশনা। সুতরাং তার একমাত্র সম্বল হলেন পথপ্রদর্শক গাইড বা মুর্শিদ, যিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও উপায় অবলম্বন বাতলে দেবেন।

ষষ্ঠ মূলনীতি

এ রাস্তায় ভ্রমণের ষষ্ঠ মূলনীতি হলো সালিককে প্রাথমিক স্তরে অতিরিক্ত প্রার্থনা, জিকির-আযকার, নফল নামায এবং অন্যান্য ইবাদতকে মিশিয়ে না করা। বরং তার উচিত হবে যে কোনো বিশেষ ধরনের জিকির [স্বীয় পীরের নির্দেশ মুতাবিক] পালন করা ও ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত নামায রীতিমতো আদায় করে যাওয়া। এগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সে নিজেকে আল্লাহর স্মরণের মধ্যে ডুবে রাখতে পারে। বলা হয়ে থাকে, জিকির হলো গুপ্ত জগতের চাবি [মিফতাহুল আলিমুল গাইব] এবং অভ্যন্তরীণ জগতের আলো। চাবি ছাড়া কেউ তালাবদ্ধ ঘরে ঢুকতে পারে না এবং আলো ছাড়া অন্ধকার ঘর আলোকিতও হয় না। সুতরাং সালিকের উচিত হলো ওভাবে আল্লাহর স্মরণ করা যেভাবে কোনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে স্মরণ করে। আর এ স্মরণ থেকে সে কখনো গাফিল থাকতে পারে না। সে এমনভাবে জিকিরের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখবে যে, স্বয়ং জিকিরই যেনো তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। তার হৃদয় জিকরুল্লাহ থেকে এক মুহূর্তও যেনো শূন্য না থাকে।

সে যখন এ জিকিরের মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকবে, তখন তা

ক্রমান্বয়ে মানবিক থেকে ঊর্ধ্বজগতের ও পবিত্র জিকিরে [জিকরে কুদসি] রূপান্তরিত হবে। 'মানবিক জিকির' হয় শব্দ, অক্ষর ও সংখ্যা দ্বারা। অপরদিকে 'জিকরে কুদসি' হয় সংখ্যা, অক্ষর ও শব্দ ছাড়াই। এ স্তরের শেষে জাকির তার স্বীয় পরিচিতি থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। সে তখন জিকির বস্তুর মাঝে ডুবে যায়। সে অজ্ঞাত হয় তার জিকির ও নিজ সম্পর্কে।

জিকিরের অবশ্যই অনেক মাত্রা আছে। কোনোটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রাথমিক স্তরে এরূপ জিকির শুরু করা বেশ কঠিন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সাধনা ও চেষ্টার মাধ্যমে এসব কাঠিন্যতা দূর হয়ে যাবে। অবশেষে জিকরুল্লাহ পরিণত হবে সালিকের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও অভ্যাসে।

সপ্তম মূলনীতি

সপ্তম মূলনীতি হলো সার্বক্ষণিক উপবাস [মানে, কম আহার ও বেশি বেশি রোযা রাখা]। কারণ এ কাজটি হলো নফ্সে আম্মারার আকাঙ্ক্ষা বিরোধী। আর এই নফ্সে আম্মারাই হলো [আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথে] সকল পর্দার মূল কারণ। এ নফ্সই হলো সত্য থেকে দূরে থাকা ও দূরত্বের ক্ষেত্রভূমি। কোনো সালিক যদি ধীরে ধীরে খাদ্যগ্রহণের মাত্রা কমিয়ে আনে, তাহলে সেটা বৈধ। এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন অনেক সুফি মাশায়িখ। যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তার জন্য এটাই উত্তম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তুমি তোমার নফ্সকে উত্তম অবস্থায় রাখো, কারণ এটাই তোমাকে বহন করে থাকে [মারকুব]; তোমার উচিত হলো এর প্রতি করুণাশীল হওয়া এবং একে যত্ন করা।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: "যে

কেহ দ্বীনকে নিজের জন্য কঠোর করে, তার নফ্‌স প্রবল হয়ে তাকে অধীনস্ত করে ফেলে।” যদি এটা জরুরী হয় যে, স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে কিংবা মেহমানদের খুশি করতে নফল রোযা ভাঙ্গতে হবে, তাহলে তার পক্ষে উচিত হলো সামান্য আহার গ্রহণ করে নেওয়া। বেশি গ্রহণ করে নফ্‌সকে একেবারে পূর্ণ তৃপ্তিদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

অষ্টম মূলনীতি

অষ্টম মূলনীতি হলো নিজের দেহকে পবিত্র রাখা। কারণ পবিত্রতা হলো ঈমানদারের হাতিয়ার এবং এটা অভ্যন্তরকে আলোকিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ওযুর ওপর ওযু করা হলো বিচারদিবসে নূরের ওপর নূরের কারণ।”

নবম মূলনীতি

নবম মূলনীতি হলো রাতকে প্রহরা ও সতর্কাবস্থায় কাটানো। সালিকের জন্য এ অভ্যেস অর্জন করা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা পরহেজগারদের [আবরার] প্রশংসা করতে যেয়ে বলেন:

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

-“তারা রাতের বেলা খুব অল্পই নিদ্রা যেতো,” [জারিয়াত (৫১):১৭]

এর অর্থ হলো, তারা রাতে অল্প ঘুমোতো এবং রাতের নীরবতাই হলো আওলিয়ায়ে কিরাম ও পবিত্রাত্মাদের জন্য আন্তরিক বিনীত প্রার্থনার সময়।

দশম মূলনীতি

সালিকের জন্য দশম মূলনীতি হলো হালাল জীবিকার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

-"হে ঈমানদারগণ! ভালো বস্তু যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি তা থেকে আহার করো ..." [বাক্বারা (২):১৭২]

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ফযর কর্তব্য পালন পরে হালাল উপার্জন হলো ফরয।" অর্থাৎ, ঈমানের মূল কর্তব্যগুলো [নামায, রোযা, জাকাত ও হাজ্জ] পালনসহ হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরয। হালাল রুজির ফলে অভ্যন্তরীণ সত্তা [বাতিন] আলোকিত হয়ে ওঠে। অপরদিকে হারাম রুজি বাতিনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে।

'উরাফায়ে কিরাম বলেছেন: যে কেউ চল্লিশ দিন যাবৎ হালাল খাদ্য দ্বারা উদরকে সন্তুষ্ট রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেন। যদি এমন হয় যে, পুরোপুরি বিশুদ্ধ হালাল উপার্জন সালিকের জন্য অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে উচিত হলো শুধুমাত্র সন্দেহমুক্ত অংশটুকু ভক্ষণ করা। আর এ অংশ থেকে যা গ্রহণ করবে তা হতে হবে শুধুমাত্র প্রয়োজনমাফিক। হালাল খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সালিক যদি গাফিলতি দেখায় তাহলে সে ইরফানের বৃক্ষের ফল গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে।

[গ্রন্থকার] হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একজন মুরীদকে সর্বাধিক কঠিন অবস্থায়ও সন্দেহজনক একটি দানাও ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকা চাই। আর সাধারণ ও সহজ অবস্থায় তো এরূপ সন্দেহজনক খাবার গ্রহণ দূরের কথা। জগতের মানুষের মধ্যে দূর্নীতির মূল কারণই হলো হালাল খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে

গাফিলতি। হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করার ফলেই সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ধর্মের মানদণ্ড হলো পরহেজগারী ও আল্লাহর প্রতি ভয়। আর ঈমান কলুষিত হয় অতিলোভের কারণে।”

উপরে সালিকের জাহিরী নীতিমালার বর্ণনা এসেছে। এ ভ্রমণে অনেক বাতিনী নীতিমালাও বিদ্যমান যা তরীকতপন্থীরা অনুসরণ করে থাকেন।

এ ভ্রমণের বাতিনী আবদ-কায়দা

এক.

সর্বপ্রথম কাজ হলো নিজের নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অর্থাৎ সালিক তার নিজের অন্তরের প্রতি সর্বদাই খেয়াল রাখবে। এক মুহূর্তের জন্যও একে ভুলে গেলে চলবে না। অন্যথায় সে প্রলোভনের বশবর্তী ও শয়তানী ইচ্ছার দিকে ধাবিত হয়ে পড়তে পারে। আল্লাহ যে সর্বদাই তাকে অবলোকন করছেন এটা তার খেয়াল থেকে কখনো যেনো ছুটে না যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

-"... অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে নীরিক্ষণ করছেন।" [৪:১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আল্লাহ তোমার হৃদয় ও আমলকে নীরিক্ষণ করেন। তোমার বাইরের কর্মকাণ্ড ও জাগতিক সম্পদ নয়।"

দুই.

দ্বিতীয় ব্যাপার হলো, বিশ্বপ্রভু আল্লাহর সম্মুখে অপমানিতভাব, ফকিরী এবং দীনতাবলম্বন। হযরত বায়িজীদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "আমার অভ্যন্তর থেকে একটি আওয়াজ [সারুশ] ওঠলো: 'হে বায়িজীদ! আমাদের খেদমতে অনেক গোলাম আছে। তুমিও যদি আমাদের হতে চাও তাহলে নিয়ে আসো অপমানিতভাব ও ফকিরী।"

তিনি আরো বলেন: "তুমি অবশ্যই নিশ্চিতভাবে জানো যে, তুমি তোমার প্রভুর প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য ব্যাপারে; সুতরাং তাঁর নিকর্দেশনামূলক নূর ও তাঁর করুণার দৃষ্টির জন্য সর্বদাই

ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার প্রয়োজন তাঁর পথনির্দেশনা ও উপজীবিকার। আর মৃত্যুর সময় তুমি তাঁর মুখাপেক্ষী, যাতেকরে ইসলামের নূর ও এর জ্ঞান তোমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। কবরেও তোমার প্রভুর প্রয়োজন যাতে করে তুমি মুনকার ও নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হও। কবরের ভয়ঙ্কর অন্ধকারে তিনিই তো তোমার একমাত্র বন্ধু।

আর মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলাই তোমার একমাত্র ভরসাস্থল শেষ বিচারদিবসে, যেদিন হলো কৃত অপরাধের জন্য তীব্র অনুশোচনার দিন। সেদিন আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর করুণা ও দয়ার বদলৌতে তোমার মুখমণ্ডলকে নূরান্বিত করেন, পাপসমূহ তাঁর কৃপার আভরণ দ্বারা গোপন রাখেন, তোমার যেটুকুই ভালো আমল ছিলো সেটুকু দ্বারা তাঁর মিযানের পাল্লাকে ভারী করেন, যদি তোমার সংরক্ষিত কর্মসমূহের হিসাবকে পরিষ্কার করে আমলনামাখানা অনুগ্রহের বদলৌতে ডান হাতে প্রদান করে দেন এবং তিনি তোমাকে পুলসিরাতের রাস্তার ওপর দৃঢ় রেখে জাহান্নামে পতন থেকে রক্ষা করে পার করে নিয়ে যান জান্নাতের দিকে, তাহলেই তো তুমি কামিয়াব হলে। আর তাঁর সর্বোচ্চ উদারতা এবং পরমোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ হলো তোমাকে তাঁর সৌন্দর্যমণ্ডিত দর্শন দ্বারা পবিত্র করা।"

এগুলো হলো ইহ-পরলোকে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পাওয়ার অপরিহার্য প্রয়োজীয়তা। সতুরাং আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে অপমানিতভাব ও ফকিরী প্রদর্শন হতে হবে সত্যিকার অপমান ও নিঃস্বতার মাধ্যমে।

তিন.

তৃতীয় ব্যাপার হলো, স্বল্পতার ক্লেশ-কষ্টে ও প্রাচুর্যের আরাম-আয়েশে, সান্ত্বনা ও বিপর্যয়ে ইত্যাদি সর্বাবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে

তাওবা ও ধৈর্যধারণ [তাওবাহ ও ইনাবাহ] করা। আল্লাহ তা'আলা নবী সুলাইমান আলাইহিস্‌সালাম সম্পর্কে বলেন: "সে একজন ভালো বান্দা ছিলো, কারণ সে ছিলো ধৈর্যশীল।"

অনুরূপ কথা আল্লাহ তা'আলা হযরত আউয়ুব আলাইহিস্‌সালাম সম্পর্কেও বলেছেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস্‌সাল যেখানে প্রভুকে অনুগ্রহ ও নিয়ামতকারী হিসাবে দেখেছিলেন, সেখানে হযরত আইউব আলাইহিস্‌সালম প্রভুকে দেখলেন তাঁর পরীক্ষক হিসাবে। না হযরত সুলাইমান আলাইহিস্‌সালামকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ রিজিকদাতার দর্শনেচ্ছু থেকে বিস্মৃত করেছে, না হযরত আইউব আলাইহিস্‌সালামকে ভীষণ ক্লেশ-কষ্ট ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা অন্ধ করেছে এসব আরোপকের হস্তকে দর্শনের ইচ্ছা থেকে। উভয় ক্ষেত্রেই, যা কিছু ঘটেছে তা সবই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখেছেন।

চার.

চতুর্থ ব্যাপার হলো, মহান আল্লাহর আদেশের ওপর আত্মসমর্পণ [তাসলিম]। তাসলিমের অর্থ হলো হৃদয় ও দেহসহ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। কারণ উভয়টিই তো আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। মালিকের নিকট সম্পদ সোপর্দ করা হলো [আত্মসমর্পণের] একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। মালিক তাঁর নিজের সম্পদকে যেভাবে ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও বিলিবন্দোবস্ত করার পূর্ণ অধিকার রাখেন। তাঁর বান্দাকে তিনি সম্মানিত করবেন না অপমানিত করবেন তা সম্পূর্ণ তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি তাঁকে জীবন দান করবেন না মৃত্যু দেবেন তা তাঁরই অধিকারভুক্ত। বান্দাকে রোগাক্রান্ত না স্বাস্থ্যবান রাখবেন, ধনী না গরীব করবেন তা সবই তাঁর ইচ্ছাধীন ও প্রাপ্য।

সুতরাং সালিকের জন্য শর্ত হলো আল্লাহর যে কোনো ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ আনতে পারবে না। সে সর্বদাই প্রকাশ্যে এবং গোপনে কোনো ধরনের অভিযোগ আনা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা তো উদ্ভট ও সকল নিয়মাদর্শের পরিপন্থী। যে দাবী করলো সে তার প্রভুর গোলাম ও প্রেমিক এবং একই সময় সেই প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো, সে তো প্রমাণ করলো তার ভালোবাসা, গোলামি ও ভক্তির মধ্যে চরম ত্রুটি বিদ্যমান।

পাঁচ.

সালিকের জন্য পঞ্চম ব্যাপার হলো, রিদ্বা [সন্তুষ্টচিত্তে মৌন সম্মতি] অবলম্বন। অর্থাৎ, তার প্রতি ঐশি বণ্টনসমূহ যদিও তা তিক্ত-কঠোর হয়, তা বিনাবাক্যে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা। সাধারণ ঈমানদারদের ক্ষেত্রে বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ [সবর] করা খাস। অপরদিকে ঈমানদার বিশিষ্টজনদের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিপর্যয়কালে সন্তুষ্টচিত্তে মৌন সম্মতি [রিদ্বা] অবলম্বন হলো খাস। সবর ও রিদ্বা'র মধ্যে পার্থক্য হলো এই: সাবির [ধৈর্যশীল ব্যক্তি] ঈমানের সদগুণ হেতু বিপর্যয়কে ধৈর্যসহ মুকাবিলা করে; তার ঈমান অপরিবর্তিত থাকে এবং বিপদের সময় সে অস্থির হয় না; সে গোলামির রাস্তা থেকে সরে যায় না- পিবদ-বিপর্যয়ের মাত্রা যতো বড়োই হোক না কেন, তার হৃদয় এর দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় মাত্র।

অপরদিকে সন্তুষ্টচিত্তে মৌন সম্মতিগ্রহণকারী ব্যক্তি [রাদ্বি] হলেন তিনি যার হৃদয় সর্বাবস্থায়ই রাজি-খুশি। বিপর্যয় ও প্রাচুর্য তার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে না। যাকিছুই তিনি [প্রভুর পক্ষ থেকে] প্রাপ্ত হোন, তিনি ধরে নেন এটা বন্ধুর পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ। তাঁর প্রেমাস্পদ ও বন্ধুর পক্ষ থেকে যেসব বিপদাপদ পতিত হয় তা তিনি ঐ ভাবে সন্তুষ্টি ও আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নেন, ঠিক যেভাবে অপর কারোর ওপর অনুগ্রহ পতিত হলে খুশি হয়।

ছয়.

সালিকের জন্য ষষ্ট ব্যাপার হলো, স্থায়ী হুযন্ [শোকাতুরতা] অর্জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক শোকাতুর অন্তরকে ভালোবাসেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি গুণ ছিলো যে, তিনি সর্বদা ধ্যানস্থ ও শোকাতুর অবস্থায় থাকতেন। উরাফায়ে কিরাম মনে করেন, প্রত্যেক হৃদয় যার মধ্যে শোকের ক্রন্দন বিদ্যমান নেই তা মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিভাবে একজন বিশ্বাসীর অন্তর প্রফুল্ল থাকতে পারে যখন সে জানে কুদরতি কলম তার ভাগ্যে কী লিখেছে, সে তা অবগত নয়? কী সে ভাগ্য- অনাবিল সুখ-শান্তি না ভীষণ দুর্দশা? এ প্রশ্নের জবাব তো কেউ জানে না।

এছাড়া, সালিক জানে না কিভাবে কোন্ অবস্থায় তার শেষ পরিণতি হবে। সে তো জানে না, আগামীকলের তার আমলটুকু কেমন [উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট] হবে? সে তো জানে না, তার আনুগত্য প্রভুর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। তার গোনাসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে কি না তাও সে অবগত নয়। শায়খ আবুল হাসান খিরক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুযন অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহান এ শায়খকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হুজুর আপনি কেনো সর্বদা ক্রন্দন করেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি চেয়েছি আল্লাহর মা‘রিফাত সেভাবে অর্জন করা যা তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কারণ কেউই তাঁর প্রাপ্য অনুপাতে তাঁকে জানতে পারবে না। [সুতরাং শোকাবস্থা ছাড়া আমার অন্তরে আর কী থাকতে পারে?]

সাত.

সপ্তম ব্যাপার হলো, আল্লাহ তা‘আলার উপর উত্তম ভরসা ও

ধারণা রাখা [হুসনুয্ যান]। একটি হাদীসে কুদসিতে তিনি বলেন:

انا عِند ظن عبدي فليظُن بي ما شاء.

-"আমি আমার বান্দার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করি যেভাবে সে আমার উপর ধারণা রাখে, সুতরাং তাকে যেভাবে চায় ধারণা করতে দাও।"

সুতরাং যে কোনো সালিকের উচিৎ হলো প্রভু সম্পর্কে ভরসা ও উত্তম ধারণা রাখা। এ স্তরে উপনীত হতে প্রয়োজন হয় আল্লাহর সৌন্দর্যের গুণাবলীসমূহের সূক্ষ্ম দর্শন- যার অন্তর্ভূক্ত হলো, উদারতা, করুণা, মহানুভবতা এবং তাঁর ক্ষমাশীলতার অসীমত্ব। যে কেউ [ক্ষমাশীলতা বা তাঁর জামালী গুণবাচক নামসমূহ সম্পর্কে] আল্লাহকে সন্দেহ করবে কিংবা তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রাখবে ও নিরাশ হবে, সে প্রভুর করুণা থেকে বঞ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রে সে তো বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, নিজের গোনাহ ও মন্দ কাজগুলো আল্লাহর করুণা ও দয়া থেকে বড়ো! এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি ভরসার ক্ষেত্রে ক্রুটি ও বিচ্যুতি প্রমাণিত হয়। সুতরাং কোনো ঈমানদারকেই কখনো আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা ও ভরসা করা থেকে বঞ্চিত হতে নেই।

আট.

অষ্টম ব্যাপার হলো, নিজেকে কখনো এ ধারণা করতে নেই যে, সে আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনার বাইরে অবস্থান করছে [মাক্র]। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

-"তারা কি আল্লাহর কর্ম-পরিকল্পনা থেকে মুক্ত? কেউই আল্লাহর কর্ম-পরিকল্পনার বাইরে বলে ধারণা করে না- শুধুমাত্র বঞ্চিতরা ছাড়া।" [আ'রাফ (৭):৯৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

-"তাদের মধ্যে জ্ঞানবানরা শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে ..."। [৩৫:২৮]

ভয় ও সম্ভ্রম ঐ ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় যে আল্লাহ তা'আলার আড়ম্বরতা ও ক্রোধ সম্পর্কিত পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করে। কারণ, ঠিক যেরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পবিত্র গুণাবলীর মধ্যে আছে অসীম দয়া ও করুণা, অনুরূপ তাঁর অসীম গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত আছে ক্রোধ ও ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

-"অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করবো।" [১১:১১৯]

নয়.

নবম বিষয় হলো, প্রেম [মুহাব্বাত]। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

-"... তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে ..." [মাইদাহ (৫):৫৪]

মুহাব্বত হলো সকল মাক্বামাত [অবস্থানস্থল] ও কারামাতের [উৎকর্ষের] নির্যাস। প্রেমের মাধ্যমেই আল্লাহর গোলাম তার মালিক আকাশ-পৃথিবীর প্রভুর দিকে অগ্রসর হতে পারে। এরই উৎকর্ষতা হেতু সে ভ্রমণের [সুলুকের] উচ্চতর মাক্বামে উপনীত হয়। প্রেম হলো

আল্লাহর সুন্দর গুণবাচক নামসমূহ [ইসমে জামাল] সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের ফল। কেউই [তার নিজের] সৌন্দর্যের অধিকারী নয় শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া। যাকিছু সৌন্দর্য ও পূর্ণতা প্রাণীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, বাস্তবে তাহলো তাঁর সৌন্দর্যের সূর্যের মধ্য থেকে একটি অংশুজাল মাত্র ও তাঁর পূর্ণতার অসীম সায়র থেকে একটিমাত্র ফোঁটা।

তুমি যদি ভাবো, সৌন্দর্য ও পূর্ণতা শুধুমাত্র বস্তুর আকার ও জাগতিক জিনিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহলে জেনে রাখো, তুমি জাগতিক [দেহধারী] আকারের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছো এবং বঞ্চিত হয়েছো মহাসত্য দর্শন থেকে। কারণ, বাস্তব সৌন্দর্য ও যৌক্তিক পূর্ণতা ক্ষমতা ও জীবনের অধিকারী সত্তার নির্যাসের মধ্যে বিদ্যমান- যার মধ্যে আছে উদারতা, বদান্যতা, সহিষ্ণুতা এবং যে সবধরনের অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এ কারণেই উদার, মহৎ এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিদেরকে সকলেই ভালোবাসে।

অনুরূপ, মুজাহিদ ও সাহসীদেরকে তাদের ক্ষমতার কারণে সকলে ভালোবাসে এবং জ্ঞানবান ও পরহেজগারদের প্রতি ভক্তি-অনুরাগ জন্মে তাঁদের সত্যবাদিতা ও পবিত্রতার কারণে। তুমি জানো, এসব প্রতিটি মহিমা ও সৌন্দর্যের গুণাবলী ঐশি নির্যাসের মধ্যে অসীম ও চিরন্তনভাবে বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে যে সৌন্দর্য ও পূর্ণতা আছে তা সীমিত, হিসাবযোগ্য, আকস্মিক, নির্দিষ্টকাল স্থায়ী ও ধ্বংসযোগ্য। আর এগুলোও মূলত দানশীলতা ও দয়ার ঐশি মহাসায়র থেকে ধারকরা মাত্র।

সুতরাং বাস্তব কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার ভালোবাসা আর কারো ও কোনো কিছুর প্রতি হতে পারে না। কারণ সকল জামালের [সৌন্দর্যের] আকার তাঁর থেকেই আহরিত। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুকে ভালোবাসে, তাহলে তো সে অবশ্যই আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন থেকে অন্ধ হয়ে গেলো।

দশ.

দশম ব্যাপার হলো, নিজের ইচ্ছা [মশি‘আহ] ও স্বাধীনতার [ইখতিয়ার] ওপর ভরসা থেকে মুক্ত হওয়া এবং একই সময় জগতের সর্বশক্তিমান প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ

-“আল্লাহ সাদৃশ্য বর্ণনা করেন: [একদিকে] একজন বান্দাহ যার নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই, এবং [অপরদিকে] আরেক বান্দাহ যাকে অমি রিজিক দিয়েছি, এবং সে গোপনে ও প্রকাশ্যে তা ব্যয় করে। তাদের উভয়ে কি সমান হলো? ...” [১৬:৭৫]

সুতরাং স্বাধীনতার সঙ্গে আল্লাহর বান্দার কোনো সম্পর্ক নেই। স্বাধীনতা তার জন্য যে সম্পূর্ণ মুক্ত। উরাফায়ে কিরাম বলেছেন, কোনো সালিকের মধ্যে যদি একটিমাত্র ইচ্ছা ক্রিয়া করে, তাহলে বুঝতে হবে তার দর্শনের সামনে পর্দা পড়ে গেছে। তারা এটাও বলেছেন, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাই হলো সর্বাধিক গাঢ় পর্দা। এমনকি আল্লাহর একত্বের মাঝে বিলীন হওয়ার ইচ্ছাপোষণও হলো সর্বাধিক অন্ধকার পর্দা। সুতরাং যেখানে আল্লাহর নৈকট্যলাভের ইচ্ছাকেও বলা হচ্ছে বড়ো পর্দা, সেখানে কেউ যখন ইন্দ্রিয়গত ইচ্ছা ও পার্থিব পাপাসক্তির মাঝে ডুবে আছে তার সম্পর্কে আর কী-ই বা বলা যেতে পারে?

সুতরাং তরিকতের সালিকের জন্য এটা অবশ্যকরণীয় যে, নিজেকে গোসলদাতাদের হাতে লাশ হিসেবে মনে করা। এভাবেই সে আল-হাক্ব [আল্লাহ তা‘আলার] এর সঙ্গে মিলন লাভে ধন্য হবে। প্রত্যেক ইচ্ছা, সালিককে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো হলো অভ্যন্তরীণ [বাতিন] পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য খুব জরুরী। এগুলো সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমেই ভ্রমণকারী সালিক আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তার নফ্‌সকে অলঙ্কৃত করতে পারে। অন্যথায় তার আন্তরিকতা ও ব্যকুল বাসনা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। তার প্রেম কেবলমাত্র মিথ্যা দাবীতে পরিণত হবে। যদিও সে নিজেকে একজন সাইর ইলাল্লাহ [আল্লাপ্রাপ্তির পথিক] মনে করে, কিন্তু বাস্তবে সে তো ইন্দ্রিয়গত ভোগবিলাসের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পড়ে আছে!

++++++++++++++++++++ **সমাপ্ত** ++++++++++++++++++++